Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলাদেশ স্টাডিজ *Subject Code* 2 0 1 1 0 7

Marks Distribution

☐ **ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান– ২০**

ক. ইনকোর্স পরীক্ষা ১৫

খ. উপস্থিতি ৫

☐ **সমাপনী পরীক্ষা : মান– ৮০**

ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১৫ × ৪ = ৬০

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ৫ × ৪ = ২০

সর্বমোট = ১০০

Exclusive Suggestions

[ক. বিভাগ] مجموعة (الف)

সম্ভাবনার হার

ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– [১৫ × ৪ = ৬০]

১. تحدث عن الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لاستقلال بنغلاديش۔ ৯৯%

[বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি আলোচনা কর।]

২. تحدث عن دور حركة اللغة فى استقلال بنغلاديش ۔ ৯৯%

[বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা কর।]

৩. عرف الدستور۔ ثم بين الحقوق الأساسية المذكورة فى دستور بنغلاديش۔ ৯৯%

[সংবিধানের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা কর।]

৪. تحدث عن دور بعض العلماء المشهورين فى إشاعة الدراسات الإسلامية فى بنغلاديش۔ ৯৯%

[বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার প্রচার প্রসারে কতিপয় প্রসিদ্ধ আলেমের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৫. اكتب أسباب مشكلة البطالة فى بنغلاديش مع بيان طرق حلها۔ ৯৯%

[বাংলাদেশের বেকার সমস্যার কারণ ও তার সমাধানের উপায়সমূহ লেখ।]

৬. بين التعديلات والمراسم لدستور بنغلاديش۔ ৯৯%

[বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী ও অধ্যাদেশসমূহ বর্ণনা কর।]

৭. اذكر الثروات الطبيعية والمعدنية لبنغلاديش وأهميتها فى الاقتصاد۔ ৯৯%

[বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বর্ণনা কর।]

مجموعة (ب) [খ. বিভাগ]

সম্ভাবনার হার

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– [৫ × ৪ = ২০]

৯৯% ৮. اكتب فقرة وجيزة حول الكثافة السكانية فى بنغلاديش۔

[বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখ।]

৯৯% ৯. بين القبائل والسكان الأصليين فى بنغلاديش۔

[বাংলাদেশে উপজাতি ও আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা দাও।]

৯৯% ১০. تحدث عن جبال بنغلاديش۔

[বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৯৯% ১১. اكتب ما تعرف عن الاقليات فى بنغلاديش۔

[বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে যা জান লেখ।]

৯৯% ১২. اكتب الخطوات المتوقعة لكثرة انتاج الأسماك الطبيعية فى بنغلاديش۔

[বাংলাদেশে প্রাকৃতিক মৎস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ লেখ।]

৯৯% ১৩. بين الموقع الجغرافى وحدود بنغلاديش۔

[বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানার বিবরণ দাও।]

৯৯% ১৪. بين تاريخ المدرسة العالية الحكومية بداكا۔

[সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-এর ইতিহাস বর্ণনা কর।]

৯৯% ১৫. تحدث عن مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية لبنغلاديش۔

[বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান আলোচনা কর।]

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলাদেশ স্টাডিজ

Solution to Exclusive Suggestions

مجموعة (الف) [ক. বিভাগ]

■ السؤال (١) : تحدث عن الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لاستقلال بنغلاديش -

■ প্রশ্ন : ১ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি আলোচনা কর।

উত্তর।। **ভূমিকা :** ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলেও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধীনতা আসেনি। কেননা পাকিস্তানের মূল ক্ষমতায় থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। তারা পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য তাকে দেশের সমুদয় সম্পদ বিভাজনের ক্ষমতা প্রদান করে। এভাবে তারা পূর্ব বাংলাকে তাদের শোষিত উপনিবেশে পরিণত করে। ফলে এ দু'অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। যার পটভূমিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

➲ বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট

নিচে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করা হলো–

১. **অগণতান্ত্রিক শাসন কার্যাবলি :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে পূর্ব বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক আইনসভা ছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা গণপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর দ্বারা। আর প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার আইনসভার মেয়াদ বৃদ্ধি করার ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্বে পূর্ব বাংলায় কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার আইনসভায় যে ৩৪টি আসন শূন্য হয়, তার কোনোটিতে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এভাবে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক শাসন বিদ্যমান ছিল।

২. **পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক যুক্তফ্রন্টের গণঅধিকার নস্যাৎ :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়; কিন্তু পূর্ব বাংলার গণমানুষের প্রতিনিধি যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা গ্রহণের দু'মাস অতিবাহিত না হতেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ৩০ মে হক মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করে।

৩. **রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার জনসাধারণের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে বাঙালির কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে এবং বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৪. **পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতারণা :** পূর্ব বাংলার জনগণ যখনই তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি তুলেছে, তখনই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ন্যায্য দাবি না মিটিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য দমননীতি গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি, মিছিলে পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার প্রভৃতির মাধ্যমেও বাঙালিকে ঠেকাতে না পেরে বারবার পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সাথে রাজনৈতিক প্রতারণা করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে; বরং বাঙালিদের সাথে প্রদত্ত ওয়াদা ভেঙে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চালায়।

৫. **রাজনৈতিক অব্যবস্থা :** ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হলেও মাত্র দু'বছরের মধ্যেই তা বিলুপ্ত হয় এবং নতুন সংবিধানটি সম্পূর্ণ সামরিক শাসনের স্বার্থের স্মারক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া ১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে সম্পূর্ণ গায়ের জোরে কোনো প্রকার বৈধতা ছাড়া দেশটি চালানো হয়েছে। যা দেশটির ভাঙনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের সামাজিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান অধীনস্থ পূর্ব বাংলার জনগণ সামাজিকভাবে বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়। নিম্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের সামাজিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **ভাষার অবমূল্যায়ন :** পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণের মাতৃভাষাকে অবমূল্যায়ন করতে থাকে। তৎকালীন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের মাতৃভাষাই ছিল বাংলা এবং উর্দু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর হার ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। তারপরও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জোরপূর্বক উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। ভাষার এ অবমূল্যায়নের কারণে পূর্ব বাংলায় সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে আন্দোলন সংগ্রাম সর্বোপরি যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

২. **বাঙালির জীবনযাত্রা প্রণালির প্রতি অবজ্ঞা :** পাকিস্তানের উভয় অংশের জীবনযাত্রা প্রণালির মধ্যেও সম্পূর্ণ ভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। পূর্ব বাংলার জনসাধারণের অর্থাৎ বাঙালিদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার সবকিছুই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঙালির জীবনযাত্রা প্রণালির এ স্বতন্ত্রতাকে অবজ্ঞা করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের মতাদর্শ ও স্বার্থ বাস্তবায়নের পাঁয়তারা চালায়। ফলে পূর্ব বাংলায় সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়।

৩. **সংকুচিত শিক্ষা সুবিধা :** সমাজ সচেতনতার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু পাকিস্তান অধীনস্থ পূর্ব বাংলা শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারেনি। শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতির কারণে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পশ্চিম পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় পূর্ব বাংলার শিক্ষা সুবিধা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

৪. **চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য :** পাকিস্তান অধীনস্থ পূর্ব বাংলার জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হয়। সামরিক ও বেসামরিক চাকরিতে পূর্ব বাংলার জনগণের অংশগ্রহণ ছিল তুলনামূলক অনেক কম। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য ড. আলীম আল রাজী এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন– ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল শতকরা ৩.৯ জন। বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলাকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল। চাকরির এ বৈষম্য পূর্ব বাংলার জনগণের সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৫. **সামাজিক আদর্শ ভুলুণ্ঠিত :** পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক জীবনযাত্রার সমগ্র ক্ষেত্রে ছিল বৈসাদৃশ্য। পূর্ব বাংলার জনগণের ধ্যানধারণা, রীতি-প্রথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুসংহত করার জন্য কোনো একক সামাজিক আদর্শ পাকিস্তানে গড়ে উঠতে পারেনি; বরং পূর্ব বাংলার মানুষের সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই আঘাত করেছে।

গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের অর্থনৈতিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট

নিম্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের অর্থনৈতিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো–

১. **অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অধীনস্থ পূর্ব বাংলায় উল্লেখযোগ্য কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় মুদ্রা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করায় অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠলেও পূর্ব বাংলার অর্থনীতি পশ্চাৎমুখী হয়।

২. **মাথাপিছু আয় :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৯-'৫০ সালে পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৭ টাকা; কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি নীতির কারণে পূর্ব বাংলার জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পায়। ১৯৫৬-'৬০ সালে মাথাপিছু আয় কমে দাঁড়ায় ২৭৭ টাকায়। অবশ্য ১৯৬৯-'৭০ সালে মাথাপিছু আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩১ টাকায় উন্নীত হয়।

৩. **রাজস্ব ব্যয় :** তৎকালীন পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের ৫৫% জনসংখ্যা বাস করতো অথচ এ অঞ্চলে উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের শতকরা ৩০% অর্থ ব্যয় করা হতো। ১৯৪৭-'৪৮ সাল থেকে ১৯৫৯-'৬০ সাল পর্যন্ত উন্নয়নমূলক খাতে সরকার সর্বমোট ৬৪২.১৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। এর মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দ করা হয় মাত্র ৯৩.৮৯ কোটি টাকা। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সাহায্য ও ঋণবাবদ লাভ করে সর্বমোট ৭০৩ কোটি টাকা। এ সাহায্য ও ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এভাবে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

৪. **রপ্তানির তুলনায় আমদানি কম :** কোনো দেশের সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি এবং রপ্তানি ও আমদানি নীতিতে ভারসাম্য থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে; কিন্তু পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলা থেকে যে পরিমাণে রপ্তানি করা হতো আমদানি করা হতো সে তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া পূর্ব বাংলার কাঁচামালে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প চলত এবং এ শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে পূর্ব বাংলা ব্যবহৃত হতো। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায়। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় আয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৫৯ ভাগ পূর্ব বাংলা রপ্তানি করতো; কিন্তু আমদানি করতো শতকরা ৩০ ভাগ।

৫. **মূলধনের অভাব :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিনিয়োগ নীতির কারণে পূর্ব বাংলায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি। অধিকন্তু মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় খুব সহজেই পূর্ব বাংলার আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পূর্ব বাংলার প্রয়োজনীয় অর্থও চেকের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনতে হতো। ফলে পূর্ব বাংলায় মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রা :** পাকিস্তানের অধীনস্থ পূর্ব বাংলা ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে ২২৪০ কোটি টাকা। তৎকালীন পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল পাট। পূর্ব বাংলার উৎপাদিত পাট থেকে বৈদেশিক মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ আসত। অথচ এদেশের পাট চাষিরা ন্যায্যমূল্য পেত না। এছাড়া পূর্ব বাংলার বৈদেশিক মুদ্রার ভিত্তিতেই বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ ও সাহায্য আসত এবং সে ঋণ ও সাহায্যের অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো।

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের সাংস্কৃতিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট

নিচে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা অভ্যুদয়ের সাংস্কৃতিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো–

১. **সাংস্কৃতিক দূরত্বের ব্যাপকতা :** পাকিস্তানের দু'অংশের জনগণের মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাংস্কৃতিক দূরত্ব ছিল ব্যাপক। তাদের ভাষা ছিল স্বতন্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল ভিন্ন। তাদের আহার্যও ছিল ভিন্ন। তারা বসবাস করেছে ভিন্ন প্রকৃতির সরকারের অধীনে। তারা অভ্যস্ত ছিল ভিন্নরূপ পীড়ন ও নির্যাতনে। এমনকি তারা দেখতেও এক রকম ছিল না। লম্বা-চওড়া সুঠাম দেহের অধিকারী পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছিল ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ফলে তাদের সংস্কৃতিও ছিল আলাদা।

২. **ভাষাগত দ্বন্দ্ব :** পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একক কোনো সাধারণ ভাষা ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ভাষা বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানে অপরিচিত ছিল। অপরপক্ষে পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট ভাষা উর্দুতে কথা বলার মতো মানুষ ছিল খুবই নগণ্য। পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতির তুলনায় উন্নত হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মনে করতো যে, পূর্ব বাংলার ভাষা ও সাহিত্য যদি হিন্দু আধিপত্যের পশ্চিম বাংলার সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলে তাহলে তা পাকিস্তানের আদর্শিক ঐক্য ব্যাহত করবে। মূলত সে কারণেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে একমাত্র উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাঙালি তা সহজে মেনে নেয়নি। পরবর্তীকালে রক্তাক্ত আন্দোলনের কারণে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া হলেও ততদিনে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অনেক দূর এগিয়ে যায়।

৩. **বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় প্রতিবন্ধকতা :** স্বৈরাচারী আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে রোমান হরফে বাংলা লেখার জন্য 'ভাষা সংস্কার কমিটি' গঠন করেন এবং এর অব্যবহিত পরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালে বেতারে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করা হয়; কিন্তু তাতেও বাঙালির সংস্কৃতির চর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়নি; বরং এ সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের কারণে বিচ্ছিন্নতার পটভূমি ক্রমশ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৪. **উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা :** পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করে ২১ মার্চ ১৯৪৮ সালের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের অপপ্রয়াস চালান। এ ঘোষণার বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে বাংলার ছাত্রজনতা ভাষা আন্দোলন সংঘটিত করে যা সমগ্র বাঙালি মানসে গভীর সচেতনতাবোধ জাগায়। এভাবে বাঙালিরা অপচেষ্টা নস্যাৎ করে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করেন; যা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানিরা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভোগ করতো। ফলে বাঙালিরাও ক্রমান্বয়ে সচেতন হতে থাকে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলে। বাঙালিদের আন্দোলন একপর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকার ও স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

■ **السؤال (٢) :** تحدث عن دور حركة اللغة فى استقلال بنغلاديش ـ

■ **প্রশ্ন : ২ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা কর।**

উত্তর ।। **ভূমিকা :** ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত আন্দোলনের দিন। বাঙালির গৌরব ও বেদনার ইতিহাস এর সাথে জড়িত রয়েছে। বাঙালিকে বুকের রক্ত দিতে হয়েছিল নিজের মাতৃভাষার যথার্থ মর্যাদা আদায়ের জন্য, তাই এ দিনটি বেদনার রক্তে রঙিন হয়েছিল। আবার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পথে বাঙালি তার ভাষার স্বীকৃতি অর্জনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে বলে এটি আমাদের জাতীয় জীবনে একান্ত গৌরবেরও। আর '৫২-র ভাষা আন্দোলনই আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ। যার ফলশ্রুতিতে বলতে হয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

➲ বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা

বাঙালিরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বঞ্চিত ছিল বলে সকল শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিল, তার প্রথম সোপান ছিল ভাষা আন্দোলন। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা করা হলো–

১. **নব জাতীয় চেতনা জাগ্রত :** পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নব জাতীয় চেতনা তথা বাঙালি জাতির মনে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। ফলে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্দোলন করার অনুপ্রেরণা পায়।

২. **সাহস ও প্রেরণার উৎস :** এদেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে ভাষা আন্দোলন জনগণের সাথে একাত্ম করে তোলে এবং সমগ্র জাতিকে সংগ্রামী চেতনায় আন্দোলিত করে। যার ফলে বাঙালির মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও সংহতিবোধের সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তী পর্যায়ের সকল আন্দোলনে প্রাণশক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

৩. **গণদাবি আদায়ের শিক্ষা লাভ :** সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে ভাষা আন্দোলনই জাতীয়তাবাদী গণদাবি আদায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করে। বাঙালি জাতি এ দৃষ্টান্ত হতে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মতো দুর্জয় সংকল্প, সাহস ও অনুপ্রেরণায় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।

৪. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ :** ভাষা আন্দোলনে অতি দৃঢ়ভাবে বাঙালি জাতীয়তার ঐক্যসূত্র গৃহীত হয়। বাঙালিরা একই জাতিসত্তায় বাঁধা– ভাষা আন্দোলনে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। ভাষা আন্দোলন তাই বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম উপাদান। আর বাঙালি এ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

৫. **হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপন :** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন। বাংলা ভাষার জন্য এ আন্দোলনে এদেশের আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করে। ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। যা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৬. **অধিকার সচেতনতাবোধ জাগ্রত :** বাঙালির অধিকার সচেতনতাবোধ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জাগ্রত হয়। বাঙালি জাতি এর মধ্য দিয়ে অন্যায়, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের শিক্ষালাভ করে।

৭. **জাতীয় সংহতি ও একাত্মবোধ সৃষ্টি :** সকল স্তরের বাঙালির মধ্যে ভাষা আন্দোলন জাতীয় সংহতি ও একাত্মবোধের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শুধু ছাত্রজনতাই নয়, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও এক কাতারে শামিল হয়ে আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে।

৮. **যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ :** '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রক্তদানের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে চেতনা বিকশিত হয়, সে চেতনা থেকেই যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে চরমভাবে পরাজিত করে।

৯. **রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ :** পূর্ববাংলার প্রভাবশালী অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ শুরু হয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে।

১০. **শহিদ মিনার স্থাপন :** ভাষা আন্দোলনের কারণে বাংলার শহর ও গ্রামে অসংখ্য শহিদ মিনার নির্মিত হয় এবং প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হওয়ার ফলে বাঙালি অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।

১১. **ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রামাণ্য চিত্র :** সমগ্র বাঙালি জাতি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের অসহযোগ আন্দোলন মূলত ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

১২. **স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা :** ভাষা আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার বীজ নিহিত ছিল। বাঙালি এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ধাপে ধাপে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

১৩. **রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন :** তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ভাষা আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। আন্দোলনের ফলে বাঙালিরা উপলব্ধি করল যে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হিসেবে অন্য সকল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। আর বাঙালিরা এ রাজনৈতিক সচেতনতাবোধের কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে বিজয় অর্জন করে।

১৪. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি :** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অবদান। বাঙালি জনসাধারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এর আসল প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এবং মুসলিম লীগের ভরাডুবিতে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে জনসাধারণ বিপুলভাবে সমর্থন করে এবং ভাষা আন্দোলন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি আস্থা জাগায়। বাঙালিকে এ আস্থাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

১৫. **ঐক্যবদ্ধ জাতি :** দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়। ছাত্র, জনতা, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সবাই একই কাতারে যুক্ত হয়। যা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১৬. **সাংস্কৃতিক আন্দোলন :** পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে থেকেই বাংলাভিত্তিক বাংলা ভাষা চর্চা ছিল; কিন্তু ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে ঢাকা ভিত্তিক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর এরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

১৭. **১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন :** ১৯৬২ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শরু হয় তাতে ১৯৫২ সালের চেতনা যথেষ্টভাবে কাজ করেছে।

১৮. **অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ :** রাষ্ট্র গঠনে ধর্মই একমাত্র কারণ হতে পরে না এটা প্রমাণিত হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ঐ আন্দোলনে সমর্থন দেয়। অসাম্প্রদায়িক ও সেক্যুলার রাজনীতি বিকাশ লাভ করে ঐ আন্দোলনের ফলে। আর এটিই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯. **রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব :** যে উৎসাহ নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল ১৯৫২ সালে এসে সেই মোহ ভেঙে যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।

২০. **স্বাধীনতা লাভ :** ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। এরপর ক্রমান্বয়ে তারা নিজেদের অধিকার ও প্রাপ্য আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের মনোভাব নিয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয় ঘটায়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তথা জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এ আন্দোলন প্রক্রিয়া ভাষা আন্দোলনরূপে সূত্রপাত হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের পর থেকেই বাঙালি ধাপে ধাপে সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। তাই বলা হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।

■ **السؤال (٣) :** عرف الدستور - ثم بين الحقوق الأساسية المذكورة فى دستور بنغلاديش -

■ **প্রশ্ন : ৩ ॥ সংবিধানের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর ॥ **ভূমিকা :** বিশ্বের প্রতিটি দেশে জনগণের কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর ব্যতিক্রম করা হয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর বাংলাদেশের সংবিধানেও নাগরিকের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬-৪৭ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

➲ সংবিধানের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মৌলিক নিয়ম-কানুনের সমষ্টিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হলো সেসব লিখিত ও অলিখিত মৌল বিধানাবলি, যা রাষ্ট্রের ক্ষমতার ব্যবহার ও বণ্টন রীতিকে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নির্ণয় করে। সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। একটি রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো কীরূপ হবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কীভাবে হবে, ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ হবে তা নির্ধারণ করে সংবিধান। অর্থাৎ সংবিধান হলো এমনই এক দর্পণ যার মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ **এরিস্টটল (Aristotle)**-এর মতে, "সংবিধান হলো এমন একটি জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র নিজেই বেছে নিয়েছে।"

২. **লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)**-এর মতে, "যেসব আইন বা প্রথা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনকে প্রভাবিত করে তার সমষ্টিকে সংবিধান বলে।"

৩. **কে. সি. হুইয়ার (K. C. Wheare)**-এর মতে, "সংবিধান হচ্ছে সেসব নিয়মের সমষ্টি যা কী উদ্দেশ্যে এবং কোন বিভাগের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা পরিচালিত হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।"

৪. **সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong)**-এর মতে, "সংবিধান হচ্ছে সেসব নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে।"

৫. **অধ্যাপক গেটেল (Gettell)**-এর মতে, "রাষ্ট্রের ধরন নির্ধারণের মৌলিক নিয়মাবলিই সংবিধান। এগুলো রাষ্ট্র সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নিয়মাবলি বর্ণনা করে।"

৬. **অধ্যাপক ডাইসি (Dicey)**-এর মতে, "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেসব নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের ও বণ্টনের রীতিনীতিকে প্রভাবান্বিত করে তাই সংবিধান।"

৭. **আর.এন. গিলক্রিস্ট (R. N. Gilchrist)**-এর মতে, "সংবিধান হলো কতকগুলো লিখিত ও অলিখিত আইন বা নীতিমালার সমষ্টি, যা দ্বারা সরকারের সংগঠন, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং সেসব সাধারণ মূলনীতিসমূহ নির্ধারিত হয়ে থাকে যার মাধ্যমে এসব ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।"

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রের সেসব মৌলিক রীতিনীতি যা দ্বারা সরকারের গঠন কাঠামো, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা এবং জনগণের উপর সরকারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নির্ধারিত হয়। প্রতিটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রই তার নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং সংবিধান দেশে বিদ্যমান সকল আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে।

➲ ১৯৭২ সালের সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারসমূহ

১৯৭২ সালের সংবিধানে লিপিবদ্ধ প্রধান মৌলিক অধিকারসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. **আইনের দৃষ্টিতে সমতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার লাভের অধিকারী। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগের বেলায় কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। সকল ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রীয় আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তির কর্ম ও দায়িত্বের ভিন্নতা থাকতে পারে এবং বিভিন্ন শ্রেণির কর্তব্য ও অধিকার ভিন্ন হতে পারে।

২. **ধর্মীয় স্বাধীনতা :** ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৮ ও ৪১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনস্বার্থ ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও প্রচারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্য এ অধিকার আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে। এছাড়া কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ বা ধমীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

৩. **সরকারি চাকরি লাভের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো নাগরিক সরকারি চাকরি লাভের অধিকারী। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৪. **বিদেশি রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির পূর্বঅনুমতি ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে খেতাব, সম্মান বা পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবে না।

৫. **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তি আইনানুসারে পরিচালিত হবেন। আইনের অনুমোদন ব্যতীত কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না।

৬. **জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা :** প্রত্যেকের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, আইনের অনুমোদন ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে।

৭. **গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে গ্রেফতারের কারণ জানার এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো বিদেশি শত্রুর ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

৮. **জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো নাগরিককে বলপূর্বক শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না। সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ হবে এবং কোনোভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৯. **বিচার ও দণ্ড সংক্রান্ত অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, কোনো নাগরিককেই প্রচলিত আইন অমান্য করার অপরাধ ব্যতীত দোষী সাব্যস্ত করা এবং আইনে নির্ধারিত দণ্ড ছাড়া অতিরিক্ত দণ্ড দেয়া যাবে না।

১০. **চলাফেরার অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিবিধান সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে যে-কোনো স্থানে বসবাস করতে পারবে এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশও করতে পারবে।

১১. **সমাবেশের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের খাতিরে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে জনসভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণের অধিকারী।

১২. **সংগঠনের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সংগঠন করার অধিকার রয়েছে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোনো সংগঠন করা যাবে না।

১৩. **বাক্‌স্বাধীনতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কে রাষ্ট্র আইন দ্বারা যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে।

১৪. **পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইনের নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার রয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে আইনসংগত কারবার বা ব্যবসাও করতে পারবে।

১৫. **সম্পত্তির অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল নাগরিকই আইনসম্মতভাবে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করতে পারবে। আইনের নির্দেশ ছাড়া নাগরিককে সম্পত্তিচ্যুত করা যাবে না।

১৬. **গৃহ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক নিজ গৃহে নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। তাছাড়া প্রত্যেক নাগরিক তার চিঠিপত্র বা যোগাযোগের (রাষ্ট্রীয় স্বার্থবিরোধী নয়) গোপনীয়তার অধিকার লাভ করবে।

১৭. **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিককে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের কাছে মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৮. **দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোনো কিছু করে থাকলে সংসদ আইনের দ্বারা সে ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করার কারণে এটি নিঃসন্দেহে একটা উত্তম সংবিধানের পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে নাগরিকগণ নিজেদের কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত হয়। জনগণ তাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও নিশ্চিত থাকতে পারে, ফলে দেশের সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না। জনগণ উপলব্ধি করতে পারে ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বাংলাদেশের সংবিধানের এসব মৌলিক অধিকারের মাধ্যমেই জনগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। অতএব প্রতিটি নাগরিকের সংবিধানে উল্লিখিত এসব মৌলিক অধিকারগুলো সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

■ السؤال (٤) : تحدث عن دور بعض العلماء المشهورين فى إشاعة الدراسات الإسلامية فى بنغلاديش.

■ প্রশ্ন : ৪ ॥ বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার প্রচার প্রসারে কতিপয় প্রসিদ্ধ আলেমের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে খ্যাতনামা আলেমদের বিশেষ অবদান রয়েছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম, সুলতান মাহমুদ ও বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে ভারতবর্ষ মুসলমানদের অধীনে আসে। এ সময় বহু সুফি সাধক, আলেম-আউলিয়া ভারতবর্ষে আসেন। তাঁরা এ অঞ্চলে ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন স্থানে 'খানকাহ' গড়ে তোলেন। যা ছিল ইসলাম প্রচারে আধ্যাত্মিক, মানবকল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলির একটি প্রধান কেন্দ্র। আলেমদের আদর্শ, চরিত্র, অসামান্য নৈতিক বল এবং দুঃস্থ মানবতার প্রতি তাদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা হিন্দু ও বৌদ্ধ শ্রেণিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

➲ বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে কতিপয় প্রসিদ্ধ আলেমের অবদান

১. **হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র) :** যেসব সুফি সাধক ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র)। ইরানের সিস্তান প্রদেশের সানজ নগরীতে তিনি ৫৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সুফিবাদের মধ্যে 'চিশতিয়া তরিকা' নামে যে তরিকা বহুল প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ সে তরিকার প্রবর্তক ছিলেন তিনি নিজে। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র) হিন্দুস্থানে আগমন করেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র)-এর পবিত্র কদম এদেশের মাটিতে পড়ায় অন্ধকার রাশি দূর এবং ইসলামের আলোয় এদেশ আলোকিত হলো।

২. **হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র) :** যেসব পীর, আলেম-আউলিয়া ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে অবদান রাখেন হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র) তাঁদের অন্যতম। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত বাদাইন জেলার 'পতজ্জীটোলা' নামক স্থানে ৬৩৬ হিজরি মোতাবেক ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তাঁর পূর্বপুরুষরা বোখারার অধিবাসী ছিলেন। পীর মুতাওয়াক্কিল (র)-এর নির্দেশ মতো তিনি দিল্লি আগমন করেন এবং সেখানে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তার করতে লাগলেন। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর চতুর্দিক হতে দলে দলে লোক ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল।

৩. **হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র) :** ভারতবর্ষে যেসব অলী, আউলিয়া, দিশেহারা মানুষকে সত্য, আলো ও শান্তির পথ দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র) ছিলেন অন্যতম। তিনি শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় আসার পথে তিনি বাদায়ুন, লক্ষ্মণাবতী ও পাণ্ডুয়ায় ইসলাম প্রচার করে এক এক রাজ্যে এক একজন খলিফা বা শিষ্যকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। এরপর তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে সিলেটে আসেন, তখন রাজা গৌর গোবিন্দ মুসলমানদের ওপর চরম অত্যাচার নির্যাতন করতো। এ ঘটনায় হযরত শাহজালাল (র) ব্যথিত হন এবং গৌর গোবিন্দকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে সিলেটে ইসলামের পতাকা উড়ান। তিনি সিলেটে আস্তানা গড়ে তোলে সদলবলে ইসলামের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের বাকি অংশ সেখানে অতিবাহিত করেন। হযরত শাহজালালের ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন লোক গাঁথা ও ছড়া প্রচলিত আছে। এ রকম একটি ছড়ার দুটি ছত্র হলো–

হিন্দু আছে লাখ লাখ নাইরে মুসলমান,
সিলেটের কাছে এসে কে দিল আজান।"

৪. **হযরত শাহ পরান (র) :** হযরত শাহজালাল (র)-এর সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর আপন ভাগনে হযরত শাহ পরান। তিনি সিলেট এসে তাঁর মামা হযরত শাহজালাল (র)-এর সংস্পর্শে থেকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান লাভ করেন। এরপর হযরত শাহজালাল (র)-এর নির্দেশে সিলেটের নিকটবর্তী লংলা, ইটা ও হবিগঞ্জে ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর তিনি সিলেট থেকে কাদিমপুরে গিয়ে টিলার উপর আস্তানা গড়ে তোলেন।

৫. **শাহ সুলতান আনসারি (র) :** মদিনার একটি আনসার পরিবারে শাহ সুলতান আনসারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ হিজরি সনে নিজ দেশ ত্যাগ করেন বলে জানা যায়। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কিছু সময়ের জন্য মুলতান ও গুজরাটে অবস্থান করেন। এরপর বাংলার দিকে শাহ সুলতান যাত্রা করেন। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে এ বিখ্যাত সাধক খানকাহ গড়ে তোলেন এবং ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অসংখ্য লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসেন।

৬. **মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) :** মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে অনবদ্য অবদান রাখেন। ১২১৫ হিজরিতে ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা আয়ত্তের পাশাপাশি মাত্র দশ বছর বয়সে কুরআন মাজিদ (৩০ পারা) মুখস্থ করেন। তিনি হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলবি (র)-এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন এবং বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এ অঞ্চলে তিনি সফলভাবে ধর্ম প্রচার করেন। জুমা ও ঈদের নামাযবিরোধী ফরায়েজিদের ইসলামের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) বাংলা ও আসামে বিভিন্ন মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হাজার হাজার মানুষ তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং বাংলা ও আসামে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

৭. **হযরত নূর-কুতুব-উল-আলম (র) :** বিখ্যাত সুফি সাধক শেখ আলাউল হক (র)-এর সুযোগ্য পুত্র ও সার্থক আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হযরত নূর-কুতুব-উল আলম (র)। তিনি গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সহপাঠী ছিলেন এবং তাঁরা উভয়ে কাজি হামিদউদ্দীন কুজানাশিনের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। যখন বাংলার রাজা ছিলেন রাজা গণেশ তখন তিনি বাংলার আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ

করেছিলেন। রাজা গণেশ শেখ ও উলামাসহ মুসলমানদের ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছিল। এমন অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে নূর-কুতুব-উল-আলম (র) জৌনপুরে সুলতান ইবরাহিম শার্কির নিকট সাহায্য চান। ইবরাহিম শার্কি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে গণেশকে আক্রমণ করলে গণেশ নূর-কুতুব-উল-আলম (র)-এর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিজ পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে বসান। অতএব বলা যায়, শুধু আধ্যাত্মিক অনুশীলন নিয়েই কুতুব-উল-আলম (র) ব্যস্ত ছিলেন না, সমসাময়িক রাজনীতিতেও বিশেষত ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় অভিযান করতেন।

৮. **হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) :** মানবজাতির কল্যাণে যুগে যুগে যেসব ব্যক্তি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়খ আহমেদ সেরহিন্দ (র) তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ৯৭১ হিজরি মোতাবেক ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষের 'সেরহিন্দ' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাছে বহু বিশিষ্ট আলেম ও মাশায়েখ বাইয়াত ও ফয়েজ লাভ করেন। তিনি মুজাদ্দিদীয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং 'মকতুবাত শরীফ' তার মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর প্রবর্তিত মুজাদ্দিদীয়া তরিকার অনুসরণ করে আজও লক্ষ লক্ষ মুসলিম হেদায়াতপ্রাপ্ত হন।

৯. **হযরত শাহ আমানত (র) :** ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ আমানত (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিহারে এক পীর পরিবারে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে লালদিঘি ময়দানের উত্তর-পূর্বে একটি খানকাহ গড়ে তোলেন এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ও আশপাশের জেলাগুলোতে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। অতঃপর তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিয়মিত মসজিদে নামায পড়াতেন এবং উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে ইসলামের নসিহত প্রদান করতেন। এরপর ধীরে ধীরে দূরদূরান্ত থেকে অমুসলিমগণ তাঁর কাছে এসে ইসলামের বয়ান শুনতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতেন।

১০. **হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র) :** যেসব সুফি সাধক বিশ্বে ইসলাম প্রচারে অনবদ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র) ছিলেন অন্যতম। তিনি ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। পীর আবু আলী কলন্দের নির্দেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচার করে তারপর চট্টগ্রামে আগমন করেন। এখানে এসে নাসিরাবাদে পর্বতের উপর আস্তানা গড়ে তোলেন এবং ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। জুনায়েদ বাগদাদী (র) হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র) সম্পর্কে বলেন, "তিনি অলীদের মধ্যে এতদূর উন্নত ও সম্মানী ছিলেন যতটা ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরাঈল (আ)।" শায়খ আবু সাঈদ বলেন, "সমস্ত দুনিয়ায় আমি বায়েজিদের মতো নেক গুণের অধিকারী কাউকে দেখিনি।"

১১. **হযরত খান জাহান আলী (র) :** ইসলাম প্রচারে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা অঞ্চলে খান জাহান আলীর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নূর-কুতুব-উল-আলম (র)-এর কাছে আধ্যাত্মিক ও মারফতি জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বাগেরহাটে কুরআন সুন্নাহভিত্তিক একটি ইসলামি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করেন, যার রাজধানী ছিল খলিফাবাদ। তিনি তাঁর রাজ্যে বহু মাদরাসা স্থাপন করেন। জনহিতকর কাজ ও ন্যায়বিচার, নির্লোভ, আধ্যাত্মিক ও মারফতি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য ইত্যাদি নানা গুণাবলির কারণে হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে আসে।

১২. **হযরত শাহ মখদুম রুপোস (র) :** ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মধ্যযুগে বাংলা অঞ্চলে যেসব পীর, দরবেশ, অলী-আউলিয়া জীবন উৎসর্গ করেন তাদের মধ্যে হযরত শাহ মখদুম রুপোস (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে এদেশে আসেন। তিনি বড় পীর আবদুল কাদের জিলানি (র)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি স্বপ্নে বড় পীরের আদিষ্ট হয়ে কিছুসংখ্যক অনুসারীসহ পাণ্ডুয়াতে পৌঁছান। পাণ্ডুয়া থেকে পৌত্তলিকতার মোকাবিলা করতে করতে বাংলার দিকে আসেন এবং রাজশাহীতে আস্তানা গড়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন।

১৩. **মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (র) :** ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বিকাশ সাধনে এবং ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মা'রিফতের শিক্ষা প্রসারে আজীবন ত্যাগ-সাধনায় নিবেদিত থেকে যারা আমাদের সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (র)। তিনি ফুরফুরা শরীফের মাওলানা শাহ সুফি আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর প্রধান খলীফা ছিলেন। বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশে, ইসলাম বিমুখ মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও মসজিদ কেন্দ্রিক মুসলমানদের সমাজব্যবস্থা নির্মাণে মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (র) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনিই এখানকার ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা এবং জীবনযাপনে আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছেন। মসজিদ কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষালয় মক্তব প্রতিষ্ঠার নির্মাতা ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রতিটি নগরে-বন্দরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘরে ঘরে তিনি 'শর্ষিণার পীর সাহেব' নামে সমধিক পরিচিত।

১৪. **অন্যান্য সুফি সাধক/আলেম ও আউলিয়া :** উল্লিখিত সুফি সাধক ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন সময় অগণিত সুফি দরবেশ আগমন করেন। তাঁরা সমাজ থেকে শোষণ, বঞ্চনা, কুসংস্কার, মূর্তি পূজা ইত্যাদি দূর করে ইসলামের সুমহান বাণীর স্পর্শে সমাজ ও জাতিকে আলোকিত করেন। এসব সুফি/আলেমদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত বা মুরিদ আজও ভারতবর্ষে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে এবং আলোকবর্তিকার মতো পথভ্রষ্ট ও দিশেহারা মানুষকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আলেম উলামা, পীর আউলিয়া ও সুফি সাধকদের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। তারা ইসলামের আলো নিয়ে এদেশে আসেন এবং শোষিত ও বঞ্চিত এবং কুসংস্কার, পাপাচার, অনাচারে নিমজ্জিত জাতিকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করান। মানবজাতিকে ইসলামি শিক্ষা, দর্শন ও প্রজ্ঞায় উজ্জীবিত করতে তাদের অতুলনীয় ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের গৌরবজনক কর্মের জন্য চিরদিন তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

■ السؤال (٥) : اكتب أسباب مشكلة البطالة فى بنغلاديش مع بيان طرق حلها ـ

■ প্রশ্ন : ৫ ॥ বাংলাদেশের বেকার সমস্যার কারণ ও তার সমাধানের উপায়সমূহ লেখ।

উত্তর ॥ **ভূমিকা :** কর্মশক্তি সম্পন্ন জনশক্তি, কর্মের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মহীন থাকাকে বেকারত্ব বলে। বাংলাদেশের বহু নারীপুরুষ বেকার জীবনযাপন করে। বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বেকার সমস্যার আশু সমাধান একান্ত আবশ্যক।

➲ বাংলাদেশের বেকার সমস্যার কারণ

বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশই বেকার। ফলে শ্রমশক্তির অপচয় হচ্ছে দারুণভাবে। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন–

১. **মূলধনের অভাব :** মূলধনের অভাবই বাংলাদেশে বেকারসমস্যার প্রধান কারণ। মূলধনের অভাবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় না। এতে শ্রমের বিপুল অপচয় ঘটে। এছাড়া মূলধনের অভাবে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে না উঠায় সেখানে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

২. **মৌসুমি বেকারত্ব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সারাবছর কাজ থাকে না। কৃষকেরা ফসলের মৌসুমে মাত্র কয়েক মাস কৃষি কাজে নিযুক্ত থাকে। বাকী সময় তাদের কোনো কাজ থাকে না। ফলে তারা বছরের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অধিকাংশ সময়ই বেকার বসে থাকে।

৩. **শিল্পে অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের গতি খুবই ধীর। মূলধনের অভাব, কাঁচামালের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, প্রতিকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে না। অপরদিকে, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির ফলে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোও বর্তমানে প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা আমাদের বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। অর্থাৎ আমাদের দেশে অধিক পরিমাণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি বলে কর্মসংস্থানের তেমন প্রসার ঘটেনি।

৪. **কুটির শিল্পের অভাব :** আমাদের দেশে কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। কিন্তু কুটির শিল্পের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কুটির শিল্পের প্রসার না ঘটায় দেশের পল্লী অঞ্চলে বেকার সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।

৫. **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** আমাদের দেশে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিবছর কর্মক্ষম লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। তবে আমাদের উন্নয়নের গতি মন্থর বলে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. **কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক কৃষি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেকারত্ব অধিক হারে বাড়ছে।

৭. **মৌসুমি শিল্প :** আমাদের দেশে এমন কিছু শিল্প আছে যেখানে সারাবছর কাজ থাকে না। যেমন চিনি শিল্প, চালের কল, ইট পোড়ানো প্রভৃতি। আখের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে চিনি শিল্পের শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে ইট নির্মাণে নিয়োজিত শ্রমিকের কাজ থাকে না। এভাবে মৌসুমের পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৮. **সংঘাতজনিত বেকারত্ব :** শ্রমিক সংগঠনের ত্রুটি, শ্রম সচলতার অভাব, নিয়োগ প্রাপ্তির তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, যন্ত্রপাতির সাময়িক বিকলতা প্রভৃতি কারণে শ্রমিকেরা অনেক সময় সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়ে। এ ধরনের বেকার সমস্যা সাময়িক হলেও বাংলাদেশে এর আধিক্য লক্ষ করা যায়।

৯. **কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** বাংলাদেশে যান্ত্রিক বেকারত্বও বিরাজমান। এদেশে শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণে। সে সাথে কৃষি বিপ্লব ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আজকাল ক্ষেত-খামারে প্রচুর পরিমাণে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ কৃষকই যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অনভিজ্ঞ। ফলে একদিকে শিল্পক্ষেত্রে এবং অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. **ছদ্মবেশী বেকারত্ব :** বাংলাদেশের কৃষিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নিয়োজিত রয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, আমাদের কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারত্বের পরিমাণ ৪০ শতাংশেরও বেশি।

১১. **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব :** আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে। কারণ দেশে কারিগরি শিক্ষার একান্ত অভাব রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে বহু শিক্ষিত ছেলেমেয়েও বেকার থেকে যায়।

১২. **বাণিজ্য চক্র :** বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের কারণে উন্নত দেশে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। এটি মূলত উন্নত দেশের সমস্যা। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ফলে উন্নত দেশে মন্দার সৃষ্টি হলে তার প্রভাব বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশেও এসে পড়ে। বিদেশে মন্দা দেখা দিলে আমাদের রপ্তানি হ্রাস পায় এবং আমাদের রপ্তানি শিল্পে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়।

১৩. **শ্রমের গতিশীলতার অভাব :** আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনও শ্রম সচলতার অভাব রয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ অনুযায়ী দেশের সর্বত্র শ্রম গতিশীল হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু পারিবারিক বন্ধন ও অন্যান্য কারণে আমাদের গ্রামাঞ্চলে শ্রমের গতিশীলতার অভাব রয়েছে।

১৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলেই কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়; কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি খুবই মন্থর। এটি আমাদের বেকার সমস্যার প্রধান কারণ।

১৫. **সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ :** বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ এ অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বলা হয়ে থাকে, আমাদের সনাতন সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসনের ফলে জনসাধারণ অনেকাংশে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, বর্ণ প্রথা প্রভৃতি উপাদান আমাদের জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের পশ্চাতে কাজ করে। এসব সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সব শ্রমিক সব রকম কাজ করতে পারে না। বিশেষ করে সামাজিক ও ধর্মীয় বাধার কারণে নারী সমাজ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মে নিয়োগ লাভ করতে পারে না। বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠার পশ্চাতে এটাও যথেষ্ট ক্রিয়াশীল।

➲ বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে–

১. **কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন :** বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে পাহাড়িয়া ও হাওড় অঞ্চলে এখনও কিছু পরিমাণে চাষযোগ্য জমি পতিত রয়েছে। এসব অঞ্চলে চাষাবাদের ব্যবস্থা করলে অনেক মৌসুমি বেকার কাজ করতে পারবে। তদুপরি এ পর্যন্ত আমাদের চাষযোগ্য জমির মাত্র ৩০ শতাংশ সেচ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে, বাকী সবই পতিত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং পতিত জমি আবাদ ও আরও অধিক পরিমাণে জমি সেচের আওতায় এনে দেশে কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২. **আত্ম-কর্মসংস্থান :** নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্ম-কর্মসংস্থান বলে। এ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়। গবাদি পশুপালন, বাড়ির আঙ্গীনায় হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন, মৎস্য চাষ প্রভৃতির মাধ্যমে সহজেই গ্রামের যুবক ও যুব মহিলারা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য উদ্যোক্তারা যেন সহজেই ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা সরকারকে করে দিতে হবে।

৩. **কর্মসংস্থান ব্যাংক :** বেকারদের ঋণ দেয়ার জন্য দেশে বর্তমানে কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। এ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গ্রামের যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন লাভজনক ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে। এ ব্যাংক ১৯৯৮ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেছে।

৪. **শিল্পোন্নয়ন :** যে দেশ শিল্পে যত উন্নত সে দেশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও অধিক থাকে। অথচ শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতাই বাংলাদেশে বেকার সমস্যার প্রধান কারণ। সুতরাং দেশে বেকার সমস্যা দূর করতে হলে শিল্পোন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে শিল্পোন্নয়নের মূল দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হয়। তাই দেশের ভারী শিল্পগুলো সরকারি খাতে রেখে অন্যান্য হালকা শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা উচিত। এতে শিল্পোন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে বেকার সমস্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে।

৫. **শ্রম-নিবিড় শিল্প :** শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে মূলধন-নিবিড় স্থায়ী ভোগ্যপণ্য অপেক্ষা সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য সস্তা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হলে শিল্পক্ষেত্রে কর্ম নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে যথাসম্ভব শ্রম-নিবিড় (labour intensive) উৎপাদন কৌশল প্রবর্তন করা উচিত। যদি কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান অন্যায়ভাবে শ্রমের পরিবর্তে মূলধন নিয়োগ করতে চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. **শিল্প কারখানায় একের অধিক শিফ্‌ট প্রবর্তন :** বাংলাদেশের মতো বেকার সমস্যায় জর্জরিত দেশে যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা রয়েছে সেগুলোকে একের অধিক শিফ্‌টের ব্যবস্থা করে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করা উচিত। এতে বেকার সমস্যার কিছুটা হলেও দূর করা সম্ভব হবে।

৭. **কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন :** গ্রামের বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের উদার ঋণনীতি গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া, কুটির শিল্পের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গ্রামের বেকার যুবক ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. **অবিরাম চাষ পদ্ধতি :** মৌসুমি বেকারত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষিতে অবিরাম চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। এ পদ্ধতিতে একটি ফসল জমি থেকে উঠার সাথে সাথে ভিন্ন আরেকটি ফসলের চাষ শুরু করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে একই জমিতে বছরে তিন-চার ধরনের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষিতে অধিক লোক নিয়োগ করা যাবে এবং এতে ছদ্মবেশী ও মৌসুমি বেকারত্বের কিছুটা হলেও অবসান ঘটবে।

৯. **গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প :** গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে স্ব-নির্ভর কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ওপর জোর দিতে হবে।

১০. **পল্লীপূর্ত কর্মসূচি :** বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় যে বিশাল বেকারত্ব বিদ্যমান তা দূর করার উদ্দেশ্যে অদক্ষ জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে সেতু ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল খননের জন্য পল্লীপূর্ত কর্মসূচি জোরদার করা উচিত। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

১১. বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা : মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আমাদের শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে আমাদের শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদেশে যাতে আমাদের শ্রমিক কর্ম নিয়োগ লাভ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রতিবছর আমাদের দেশ থেকে প্রায় ৮০ হাজার লোক চাকরি গ্রহণ করে বিদেশে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধারা আরও জোরদার করতে হবে।

১২. শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন : বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা; কোনো প্রকার পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা নয়। কিন্তু পেশাগত ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে আমাদের শ্রমশক্তি তাদের শ্রম ব্যয় করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার জন্য প্রয়োজন পেশাগত ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা যা আমাদের সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা দিতে অপারগ।

১৩. শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি : বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হলে শ্রমের গতিশীলতা আনয়ন জরুরি। আমাদের দেশে শ্রমের ভৌগোলিক ও কারিগরি উভয় প্রকার গতিশীলতাই কম। পারিবারিক স্নেহ-মমতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব প্রভৃতি কারণে শ্রমের ভৌগোলিক গতিশীলতা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে শ্রমের বৃত্তিগত গতিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ সকল বাধা অপসারণ করে শ্রমের গতিশীলতা বাড়াতে পারলে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৪. প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির পরিবর্তন : বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি পরিবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ এগুলোর কুফল আমাদের জনগোষ্ঠীকে কর্মবিমুখ করে তোলে। ফলে আমাদের শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ বেকার থেকে যায়। এসব প্রথার মধ্যে রয়েছে যৌথ পরিবার প্রথা, বর্ণ প্রথা, রক্ষণশীলতা এবং বিভিন্ন ধরনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি। এসব দূর করে জনগণের মধ্যে মর্যাদাবোধ এবং আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, কর্মহীন বেকার জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে যোগ্যতানুযায়ী কর্মে নিয়োজিত করতে পারলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারবে। যার ফলশ্রুতিতে খুব দ্রুতই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। আর তাই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের জায়গা করে নিতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে।

■ **السؤال (٦) :** بين التعديلات والمراسم لدستور بنغلاديش -

■ **প্রশ্ন : ৬ ॥ বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী ও অধ্যাদেশসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর।। **ভূমিকা :** একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধান যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এর সংশোধনীও প্রয়োজন। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর হয়। এটি একটি দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান এবং এর সংশোধন প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। সময়োপযোগী বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে সংবিধানকে গতিশীল করার জন্য এটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবিধানও বহুবার সংশোধিত হয়েছে।

➲ **বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ :** স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হওয়ার পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে। নিচে সংশোধনীসমূহ বর্ণনা করা হলো–

প্রথম সংশোধনী : সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিল পাস হয় ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই। সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা হয়। তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। পরে এটি ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়।

দ্বিতীয় সংশোধনী : ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল পাস হয়। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমণে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণার বিধান চালু করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। বিলটি পাসের দুইদিনের মাথায় ২২ সেপ্টেম্বর এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়।

তৃতীয় সংশোধনী : ১৯৭৪ সালের ২৩ নভেম্বর এ সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময় বিধান প্রণয়ন করা হয়। বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ১৯৭৪ সালের ২৭ নভেম্বর।

চতুর্থ সংশোধনী : ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি এ সংশোধনী আনা হয়। সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন এ সংশোধনীর মূল কথা। বিলটি পাস হওয়ার দিন ২৫ জানুয়ারিই তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়।

পঞ্চম সংশোধনী : জাতীয় সংসদে এ সংশোধনী আনা হয় ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দানসহ সংবিধানে এর মাধ্যমে "বিসমিল্লাহির-রাহমানির রাহিম" সংযোজন করা হয়। পরে সংশোধনীটি উচ্চ আদালতের রায়ে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবৈধ ঘোষিত হয়ে যায়।

ষষ্ঠ সংশোধনী : ১৯৮১ সালের ৮ জুলাই এ সংশোধনী আনা হয়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের স্ব পদে বহাল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা হয় এ সংশোধনীর মাধ্যমে। এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ওই বছরের ১০ জুলাই।

সপ্তম সংশোধনী : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে এইচএম এরশাদের সামরিক শাসন বহাল ছিল। ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর জাতীয় সংসদে সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমেই এইচএম এরশাদের ওই সামরিক শাসনের বৈধতা দেওয়া হয়। ১১ নভেম্বরেই এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। ৫ম সংশোধনীর মতো এ সংশোধনীকে ২০১০ সালের ২৬ আগস্ট বাংলাদেশের উচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করে।

অষ্টম সংশোধনী : ১৯৮৮ সালের ৭ জুন সংবিধানে অষ্টম সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি প্রদান করা ও ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করার বিধান চালু করা হয়। Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bangali-এর নাম Bangladeshi- তে পরিবর্তন করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। সংশোধনীটি দুইদিন পর ৯ জুন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। তবে পরবর্তীতে ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠনের বিষয়টি বাতিল করে দেন সর্বোচ্চ আদালত।

নবম সংশোধনী : নবম সংশোধনী আনা হয় ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সঙ্গে একই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তির পর পর দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ১১ জুলাই। তবে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলে এ সংশোধনী কার্যকারিতা হারায়। যদিও সংশোধনীটি বাতিল করা হয়নি।

দশম সংশোধনী : সংবিধানের দশম সংশোধনী আনা হয় ১৯৯০ সালের ১২ জুন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩ (২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষ্য সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরও ১০ বছর কালের জন্য সংরক্ষণ করার বিধান করা হয়। এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন হয় ১৯৯০ সালের ২৩ জুন।

একাদশ সংশোধনী : গণঅভ্যুত্থানে এইচ এম এরশাদের পতনের পর বিচারপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে ১৯৯১ সালে ৬ আগস্ট এ সংশোধনী পাস হয়। এর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগদান বৈধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাবার বিধান পাস করানো হয় এ সংশোধনীতে। এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ১০ আগস্ট।

দ্বাদশ সংশোধনী : ১৯৯১ সালের ৬ আগস্টের এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৭ বছর পর দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ওই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর।

ত্রয়োদশ সংশোধনী : ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ২৮ মার্চ। উচ্চ আদালতের আদেশে ২০১১ সালে এ সংশোধনীটি বাতিল হয়।

চতুর্দশ সংশোধনী : ২০০৪ সালের ১৬ মে এ সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০ থেকে ৪৫টি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি এবং সরকারি ও আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি বা ছবি প্রদর্শনের বিধান করা হয়। এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ১৭ মে।

পঞ্চদশ সংশোধনী : পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয় ২০১১ সালের ৩০ শে জুন এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন হয় ২০১১ সালের ৩ জুলাই। এ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পুনর্বহাল করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বিদ্যমান ৪৫-এর স্থলে ৫০ করা হয়। এছাড়াও সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদের পরে ৭ (ক) ও ৭ (খ) অনুচ্ছেদ সংযোজন করে সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ করা হয়।

ষোড়শ সংশোধনী : ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে এ সংশোধনী আনা হয়। ৭২ এর সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান পাস করা হয় এ সংশোধনীর মাধ্যমে। পরে হাইকোর্ট বিভাগ একে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়। আপিল বিভাগও ওই রায় বহাল রাখে।

সপ্তদশ সংশোধনী : ৮ জুলাই ২০১৮ সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে সংরক্ষিত নারী সাংসদদের আসনের মেয়াদ আরও ২৫ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ২৯ জুলাই ২০১৮ এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়।

➲ অধ্যাদেশসমূহ

অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা : বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী আইন প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতা বাংলাদেশের পার্লামেন্ট অর্থাৎ, জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত করা হলেও কোনো উদ্ভূত জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির এই বিশেষ আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সংবিধানে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা (Ordinance Making Power of the President) বলা হয়। জাতীয় সংসদের অধিবেশন কাল ছাড়া অথবা সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া বা মেয়াদ শেষ হওয়ার কালে রাষ্ট্রের যেকোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যে আদেশ জারির মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে তাকে অধ্যাদেশ বলে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদের বিধান মতে, সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় অথবা তার অধিবেশন কাল ব্যতীত কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আন্তঃব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন, সেরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন এবং জারি হওয়ার সময় হতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

অধ্যাদেশ প্রণয়নের শর্তসমূহ : বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। যদিও এরূপ অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। তবে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ বা শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক তা হলো– ১. সংসদ সাংবিধানিকভাবে যে আইন প্রণয়ন করতে পারে না, রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে তা করতে পারবেন না। ২. রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তন বা রহিত করতে পারবেন না। ৩. পূর্ব জারিকৃত কোনো অধ্যাদেশকে পরবর্তী অধ্যাদেশের মাধ্যমে বলবৎ করা যাবে না।

অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের বিধান : বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে এটা সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। সংবিধানের কোনো পরিবর্তন আনা বা এটা সংশোধনের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী আইন পরিষদ বা জাতীয় সংসদ। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করলে তা সংশোধন করা যায়; কিন্তু অত্র অনুচ্ছেদে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের কোনো বিধান নেই। আবার পূর্বে প্রয়োজনে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের বিধান থাকলেও ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এটা বিলুপ্ত করা হয়। তবে পূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের নজির এদেশে রয়েছে। যেমন ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের রদবদল করেন। এ সময় সংবিধান সংশোধনের জন্য দুইটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। প্রথম অধ্যাদেশ বলে সংবিধানের ৪৮, ৫৫ এবং ১৪৮ নং অনুচ্ছেদগুলোর সংশোধন করা হয়। আবার দ্বিতীয় অধ্যাদেশটিতে এরূপ ঘোষণা করা হয়, রাষ্ট্রপতি যদি কোনো কারণে তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পদত্যাগ করতে চান তাহলে এ আদেশ বলে তিনি তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে তার নিকট দায়িত্বভার অর্পন করবেন। এ সংশোধনীতে আরও উল্লেখ করা হয়, রাষ্ট্রপতি সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তার জারিকৃত যে-কোনো আদেশ সংশোধন করতে পারবেন। ১৯৭৮ সালে অপর এক ঘোষণার মাধ্যমে জারিকৃত সংবিধানের ৫ম সংশোধনী আইনে ৪ নং আদেশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৮ (১) অনুচ্ছেদের পরিবর্তন করা হয়েছিল। অর্থাৎ, সংবিধানের মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির পরিবর্তে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন হবে যাবতীয় কার্যাবলির মূলভিত্তি।" এ সংশোধনীর আদেশটি ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। ফলে এটি বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির একটি হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি তার বিশেষ ক্ষমতা বলে কতিপয় প্রশাসনিক আদেশকে সংবিধানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেন, যা পরবর্তীতে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত হয়। এভাবে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে থাকেন।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবিধানে বিভিন্ন সময় সংশোধনী আনা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে। তবে ২/৩টি সংশোধনী জনমতের ভিত্তিতে না হওয়ায় তা বিভিন্ন মহলে বিতর্কিত হয়। এমনকি সংশোধনীগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও স্বার্থগোষ্ঠীর অনুকূলে প্রণীত হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠে। পরবর্তীতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে আবার গণতান্ত্রিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়।

■ **السؤال (٧) :** اذكر الثروات الطبيعية والمعدنية لبنغلاديش وأهميتها فى الاقتصاد۔

■ **প্রশ্ন : ৭ ॥ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বর্ণনা কর।**

উত্তর।। **ভূমিকা :** পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি প্রভৃতি, সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

➲ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের বিবরণ

নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো–

১. **মাটি :** মাটি বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। বেশির ভাগ এলাকায় বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ে প্রচুর প্রাণিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

২. **বনজ সম্পদ :** বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ভূ-ভাগের ১৬ ভাগ হচ্ছে বন। বনে রয়েছে মূল্যবান গাছপালা। এগুলো আমাদের ঘরবাড়ি ও আসবাব তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বনে রয়েছে পাখি ও প্রাণীসম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনে গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের আরও বেশি অর্থাৎ ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন।

৩. **প্রাণীসম্পদ :** আমাদের প্রাণীসম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি। এগুলো গৃহপালিত প্রাণী। এছাড়াও রয়েছে নানা প্রজাতির পাখি।

৪. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ১৯১০ সালে এ দেশে অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়। ১৯৫৫ সালে সিলেটে সর্বপ্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুসারে এ পর্যন্ত দেশে মোট ২৮টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ২৮টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট প্রাক্কলিত মজুদের পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০২২ এ উত্তোলনযোগ্য নিট মজুদের পরিমাণ ৯.৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সার উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালি জ্বালানি ও অন্যান্য শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

৫. **খনিজ তেল :** খনিজ তেল হলো পেট্রোলিয়ামের তরল রূপ, যা ভারী হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি। বাংলাদেশে এখনও উল্লেখযোগ্য কোনো তেল খনি আবিষ্কৃত হয়নি। ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে সর্বপ্রথম একটিমাত্র তেল খনি পাওয়া গিয়েছে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত হরিপুরের তেল খনি হতে ৬.৫ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ খনি হতে তেল উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে খনিজ তেল সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

৬. **চুনাপাথর :** সিমেন্ট, গ্লাস, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি শিল্পে ও গৃহ নির্মাণে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া রং ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্তুতেও চুনাপাথর কাজে লাগে। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট, চারগাঁ, লালঘাট, ভাজ্ঞারহাট ও বাগলি বাজারে চুনাপাথরের খনি আছে। এ সমস্ত খনিতে প্রায় ৪.৫ কোটি মেট্রিক টন চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। এখান থেকে ছাতকের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে চুনাপাথর সরবরাহ করা হয়। এছাড়া জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জে ১০ কোটি মেট্রিক টন চুনাপাথর সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তদুপরি, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিন দ্বীপেও চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদেশে বছরে গড়ে প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন চুনাপাথর উত্তোলন করা হয়।

৭. **কয়লা :** কয়লা সাধারণত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, রংপুর জেলার খালাসপীর, জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি ও দিঘীপাড়ায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে ইতোমধ্যে কয়লা উত্তোলন হচ্ছে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আবিষ্কৃত মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের (রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং জয়পুরহাটের (জামালগঞ্জ) মজুদ প্রায় ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন।

৮. **সিলিকা বালি :** কাচ তৈরিতে সিলিকা বালি কাজে লাগে। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, জামালপুর ও কুমিল্লা জেলায় সিলিকা বালি পাওয়া যায়। হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জামালপুর জেলার বালিজুড়িতে প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন সিলিকা বালি সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এছাড়া কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন সিলিকা বালি সঞ্চিত আছে।

৯. **শক্ত পাথর বা কঠিন শিলা :** রেল লাইন, বাঁধ নির্মাণ ও রাস্তাঘাট তৈরি করতে শক্ত পাথরের প্রয়োজন হয়। রংপুর ও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শক্ত পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৬৬ সালে রংপুর জেলার রানীপুকুর এলাকায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া রানীপুকুরের প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থানেও ১৯৭৪ সালে অনুরূপ শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ শিলা খনির আয়তন ১.২ বর্গ কিলোমিটার, যা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ১৯৯৪ সালের ২০ অক্টোবর।

১০. **আণবিক খনিজ পদার্থ :** কক্সবাজার ও টেকনাফের সমুদ্র সৈকতে এবং কুতুবদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে মোনাজাইট, মেগনেটাইট, ইলমেনাইট প্রভৃতি আণবিক খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। এ সমস্ত আণবিক খনিজ পদার্থ কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে এ প্রকল্পে সহায়তা দানের আশ্বাস দিয়েছে।

১১. **তামা :** বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মুদ্রা, বাসনপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করতে তামার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার স্তরে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

১২. **নুড়ি পাথর :** প্রধানত রাস্তাঘাট ও গৃহ নির্মাণে নুড়ি পাথর ব্যবহৃত হয়। সুনামগঞ্জ জেলার ভোলাগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ, পঞ্চগড়ের সদর উপজেলায়, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম এবং সিলেটের তামাবিল অঞ্চলে নুড়ি পাথর পাওয়া যায়।

১৩. **চীনামাটি :** চীনামাটি এক ধরনের উন্নতমানের সাদা রঙের কাদা, যার প্রধান উপাদান হলো কেয়োলিনাইট। সিরামিক শিল্পে চীনামাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৫৭ সালে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরে চীনামাটি স্তরের আবিষ্কার ঘটে। এছাড়া নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের মধ্যপাড়া, বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া এবং জয়পুহাটের পাঁচবিবিতে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৪. **লবণ :** প্রাকৃতিক সম্পদ লবণ শুধু আহার্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, এটি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনেও কাজে লাগে। কসটিক সোডা ও ঔষধ প্রস্তুতেও লবণ অত্যাবশ্যক। চামড়া পাকাকরণ ও খাদ্য সংরক্ষণেও প্রচুর লবণের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে এখনও লবণ খনি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ কুইন্টাল লবণ উৎপাদন করা হয়।

➲ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রভাব

নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রভাব আলোচনা করা হলো–

১. **অর্থনীতির কাঠামো :** বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি আমাদের জাতীয় আয়েরও প্রধান উৎস। বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষিখাত থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষির উপর এরূপ নির্ভরশীলতার পেছনে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের পলিগঠিত সমতল উর্বর জমিতে অল্প খরচে ফসল উৎপাদন করা যায়। ফলে এদেশের মানুষ কৃষিকেই প্রধান উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

২. **শিল্পোন্নয়ন :** আমাদের শিল্পোন্নয়নও প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমত আমাদের শিল্পোন্নয়ন প্রাথমিক পর্যায়ে কতিপয় কৃষি পণ্যের উপর ভিত্তি করে যাত্রা শুরু করেছে। পাট ও ইক্ষু আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। তাই এদেশে পাট ও চিনি শিল্পের প্রসার ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, পশু মাংস এদেশের মানুষের প্রিয় খাদ্য। গবাদি পশু থেকে প্রতিবছর আমরা প্রচুর চামড়া পাই। এ সমস্ত পশু চামড়ার উপর ভিত্তি করে আমাদের ট্যানারী শিল্প গড়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ একটি অতি জনবহুল দেশ। ফলে শ্রম খুবই সহজলভ্য। তাই এদেশে শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প গড়ে উঠেছে। সস্তা শ্রমের কারণেই আমাদের পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে সাফল্য লাভ করেছে।

৩. **শক্তি সম্পদ :** শক্তি সম্পদ অর্থনৈতিক তথা শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি। বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। তাই গ্যাস ব্যবহার করে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও গ্যাসকে তেলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। তদুপরি, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করে দেশে কয়েকটি সার কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

৪. **যাতায়াত ব্যবস্থা :** আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে পরিবহণ ও যোগাযোগের অবদান প্রায় ১১.১৩ শতাংশ। আমাদের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৫৬৯ কি.মি. সড়ক রয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সারা বছর ৩,৮০০ কিলোমিটার জলপথ থাকে। বর্ষাকালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়। বাংলাদেশে ছোট বড় বহু নদ-নদী আছে এবং এর সবগুলোই নাব্য। ফলে এদেশের যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থায় জলপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **মৎস্য উৎপাদন :** বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওড়-বাঁওড়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছ ধরা ও মৎস্য ব্যবসায়ে এদেশের প্রচুর লোক নিয়োজিত আছে। মৎস্য খাত আমাদের কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম উৎস। মৎস্য খাত আমাদের দেশজ উৎপাদনেও (GDP) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মৎস্য রপ্তানি করেও বাংলাদেশ প্রচুর আয় উপার্জন করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ২.০৮ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষিখাতে মৎস্য খাতের অবদান ২১.৮৩ শতাংশ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় খনিজ সম্পদ কম, তবে বাংলাদেশে যে বিপুল অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে সেগুলো আবিষ্কার, উত্তোলন এবং উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত হবে।

مجموعة (ب) [খ. বিভাগ]

■ **السؤال (٨) :** اكتب فقرة وجيزة حول الكثافة السكانية فى بنغلاديش ـ

■ **প্রশ্ন : ৮ ॥ বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখ।**

উত্তর ॥ **ভূমিকা :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনসংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার জনসংখ্যাও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর উভয় বিষয়ই জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি দেশে প্রতি বর্গমাইল বা প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে যে পরিমাণ মানুষ বসবাস করে, তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। একটি দেশের মোট জনসংখ্যাকে মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে জনসংখ্যা ঘনত্ব পাওয়া যায়। বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।

➲ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৪ সালে এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৯৭ জন এবং ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০১৫ জন। এর থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে ৩৭ বছরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. অনুকূল জলবায়ু; ২. অতি সহজে চাষ করা যায় এমন বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল; ৩. নাতিশীতোষ্ণ ও মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ু; ৪. উর্বর ভূমি; ৫. প্রচুর বৃষ্টিপাত; ৬ একান্নবর্তী পরিবারের আধিক্য; ৭. মৃত্যুহারের তুলনায় অধিক জন্মহার; ৮. নিম্ন জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ :

$$DP = \frac{TP}{TA}$$

যেখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population),
TP = মোট জনসংখ্যা (Total Population),
TA = মোট আয়তন (Total Area).

সূত্রটি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে।

যেমন– ২০১১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩ শত ৬৪ জন এবং বাংলাদেশের মোট ভৌগোলিক আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এবার এ উপাত্ত জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রে উপস্থাপন করি,

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)} = \frac{১৪,৯৭,৭২,৩৬৪}{১,৪৭,৫৭০} = ১০১৪.৯২ = ১০১৫ \text{ জন (প্রায়)}$$

অর্থাৎ, ২০১১ এর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো ১০১৫ (প্রায়) বা বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটার ১০১৫ জন লোক বসবাস করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, যেকোনো দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর একদিকে যেমন জনসংখ্যা পরিমাণের উপর অপরদিকে তেমনি দেশের ভৌগোলিক আয়তনের উপরও। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এ ঘনবসতির অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি; কিন্তু সেই তুলনায় আয়তন অনেক কম।

■ **السؤال (٩) :** بين القبائل والسكان الأصليين فى بنغلاديش -

■ প্রশ্ন : ৯ ॥ বাংলাদেশে উপজাতি ও আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলাদেশে কারা উপজাতি ও কারা আদিবাসী এ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এ বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে। সংবিধানে কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাই বাংলাদেশের পাহাড়ে বা সমতলে বসবাসরত সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপজাতি হিসেবে গণ্য হয়।

➲ বাংলাদেশের উপজাতি

উপজাতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Tribe। এটা উপনিবেশিক শব্দ। উপজাতি বলতে এমন জনগোষ্ঠীগুলোকে বুঝায় যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি কিন্তু নিজস্ব একটি আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মূলত রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতি বা উপজাতি নির্দিষ্টকরণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বাঙালি মূলধারার বাইরে যারা আছে তারাই উপজাতি হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠীসমূহ হচ্ছে- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মগ, মুরং, হাজং ইত্যাদি। বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানে রয়েছে চাকমা উপজাতির লোকজন। মূলত ১৬০০ সালের পর থেকে তারা এ দেশে আসতে শুরু করে। একেক উপজাতিদের জন্য এ দেশে আগমনের কারণ ছিল একেক রকম। কেউ বিতাড়িত হয়ে, কেউ প্রাণের ভয়ে, কেউবা শুধুমাত্র শখের বশে এ দেশে এসে বসবাস করছে। উপজাতিরা বেশিরভাগই আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে।

➲ বাংলাদেশের আদিবাসী

আভিধানিক ও নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আদিবাসী মানে আদিবাসিন্দা। আদিবাসী শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Indigenous people। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মর্গানের সংজ্ঞানুযায়ী আদিবাসী হচ্ছে, "কোনো স্থানে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী, যাদের উৎপত্তি, ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা নেই।" আক্ষরিক অর্থে ও আভিধানিক সংজ্ঞানুসারে কোনো দেশ বা স্থানের আদিম অধিবাসী বা অতিপ্রাচীনকাল থেকে বসবাসরত জনগোষ্ঠীই ওই অঞ্চলের আদিবাসী। সে অর্থে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে বসবাসরত বাঙালিরাই এদেশের আদিবাসী। বর্তমানে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে আগত অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের অধিবাসী বটে, আদিবাসী নয়। কেননা বাঙালিরা বাংলাদেশে সবার আগে থেকে বসবাস করছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আদিবাসীদের উপজাতি হিসেবে সম্বোধন করা একেবারেই অনুচিত। কারণ তারা কোনো জাতির অংশ নয় যে তাদের উপজাতি বলা যাবে; বরং তারা নিজেরাই এক একটি আলাদা জাতি। যেমন, বাংলাদেশের বাঙালিরা আলাদা একটি জাতি, তাই তারা বাংলাদেশের আদিবাসী। আর অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠী হচ্ছে বাংলাদেশের উপজাতি।

■ **السؤال (١٠) :** تحدث عن جبال بنغلاديش -

■ প্রশ্ন : ১০ ॥ বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলাদেশ প্রধানত পলিমাটির দেশ। এদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে। বাংলাদেশের ভূমিগঠন ও রূপান্তরে প্রাকৃতিক অবস্থান উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, পূর্বে টারশিয়ারি পাহাড়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় রয়েছে।

➲ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ পাহাড়সমূহ

নিচে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ পাহাড়সমূহ উল্লেখ করা হলো–

১. **সাকা হাফং পাহাড় :** সাকা হাফং পাহাড় বাংলাদেশের মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্নে অবস্থিত। এর উচ্চতা ১,০৫২ মিটার (৩৪৫১ ফুট)। বর্তমানে বান্দরবানের থানচি উপজেলায় এটির অবস্থান।

২. **কংলাক পাহাড় :** কংলাক পাহাড় বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার অন্তর্গত সাজেক ইউনিয়নে অবস্থিত। এটি সাজেক ভ্যালির সর্বোচ্চ চূড়া। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা প্রায় ১৮০০ ফুট। পাহাড়ের নিচে কংলাক ঝরনা অবস্থিত এবং এ ঝরনার নামানুসারেই এ পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছে।

৩. **কালা পাহাড় :** কালা পাহাড় হচ্ছে বৃহত্তর সিলেটের সর্বোচ্চ বিন্দু বা চূড়া। এমনকি এটি বাংলাদেশের উত্তর অংশেরও সর্বোচ্চ বিন্দু। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কালা পাহাড়ের উচ্চতা ১১০০ ফুট। কালা পাহাড় পর্বতশ্রেণিকে স্থানীয় ভাষায় লংলা পাহাড়শ্রেণি বলা হয়। কালা পাহাড় হচ্ছে সর্বোচ্চ চূড়ার স্থানীয় নাম। বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে, এ পাহাড়টি হারারগঞ্জ পাহাড় নামেও পরিচিত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় অবস্থান করা এ পাহাড়ের ৬০% বাংলাদেশে পড়েছে এবং বাকি অংশ ভারতের উত্তর ত্রিপুরায় অবস্থিত।

৪. **কেওক্রাডং পাহাড় :** কেওক্রাডং বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা বান্দরবানের রুমা উপজেলায় অবস্থিত। কেওক্রাডং শব্দটি মারমা ভাষা থেকে এসেছে। মারমা ভাষায় কেও মানে 'পাথর', কাড়া মানে 'পাহাড়' আর ডং মানে 'সবচেয়ে উঁচু'। অর্থাৎ, কেওক্রাডং মানে সবচেয়ে উঁচু পাথরের পাহাড়।

৫. **গারো পাহাড় :** গারো পাহাড় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো-খাসিয়া পর্বতমালার একটি অংশ। এর কিছু অংশ ভারতের আসাম রাজ্য ও বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত। এছাড়া ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জ জেলায় এর কিছু অংশ আছে। গারো পাহাড়ের বিস্তৃতি প্রায় ৮০০০ বর্গকিলোমিটার। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড়। এটি গারো সম্প্রদায়ের মূল বাসভূমি। গারো পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম নক্রেক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৪,৬৫২ ফুট।

৬. **চন্দ্রনাথ পাহাড় :** চন্দ্রনাথ পাহাড় হিমালয় হতে বিচ্ছিন্ন হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলীয় অংশ। এটি সীতাকুন্ড পাহাড় নামেও পরিচিত। এ পাহাড়টি হিমালয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক ঘুরে ভারতের আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যদিয়ে ফেনী নদী পার হয়ে চট্টগ্রামের সঙ্গে মিশেছে। এ পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত হয়েছে সীতাকুন্ড ইকো পার্ক। সীতাকুন্ড শহরের পূর্বে অবস্থিত চন্দ্রনাথ শৃঙ্গ প্রায় ১০২০ ফুট অথবা ৩১০ মিটার উঁচু এবং চট্টগ্রাম জেলার সর্বোচ্চ স্থান।

৭. **লালমাই পাহাড় :** লালমাই পাহাড় বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলায় অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণি। প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর আগে প্লাইস্টোসিন যুগে এ পাহাড় গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। লালমাই পাহাড়ের দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার এবং এ পাহাড়ের মাটি লাল রংয়ের। এর কারণে একে লালমাই পাহাড় বলা হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের পাহাড়সমূহের ভূমিরূপ টারশিয়ারী যুগের এবং বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ ভাঁজ প্রকৃতির। টারশিয়ারী যুগে হিমালয় পর্বত উদয় হওয়ার কালে পাহাড়ি অঞ্চলের গিরিখাত গঠিত হয়। মিয়ানমারের দিক হতে ভূ-আলোড়নের প্রভাবে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার জেলায় এ পাহাড়ি এলাকাগুলোর উদ্ভব হয়।

■ **السؤال (١١) :** اكتب ما تعرف عن الاقليات فى بنغلاديش -

■ **প্রশ্ন : ১১ ॥ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে যা জান লেখ।**

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলাদেশে বৃহত্তর নৃগোষ্ঠী বাঙালিদের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম হলো চাকমা, গারো, সাঁওতাল, মারমা, রাখাইন ইত্যাদি।

➲ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

আধুনিক বিশ্বে প্রায় সব বৃহৎ রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে। বিভিন্ন কারণে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। মনীষী এফজে ব্রাউন (FJ Brown) তার One America গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, কোনো দেশের প্রভাবশালী বৃহৎগোষ্ঠী দ্বারা নিরূপিত হয়। কোনো বৃহৎ সমাজ বা দেশে বসবাসরত এমন জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলা হয়, যারা সেদেশের আর্থ-সামাজিক দিক হতে প্রভাবশালী বৃহৎ জনগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হলো–

- এদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম;
- প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী দ্বারা সংখ্যালঘু হিসিবে চিহ্নিত;
- সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে;
- সংখ্যালঘুরা সামাজিকভাবে উপেক্ষিত;
- সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী দ্বারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়;
- সংখ্যালঘুরা মানবিক দিক থেকে নিজেদের অনেকক্ষেত্রে অবহেলিত ও হেয় প্রতিপন্ন মনে করে অর্থাৎ হীনমন্যতায় ভোগে;
- অনেক সময় সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিজেদেরকে উৎকৃষ্ট মনে করে। ইউরোপীয় শ্বেতকায় নরগোষ্ঠীর লোক কৃষ্ণকায় ও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করেও নিজেদের উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির অধিকারী মনে করে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন উপজাতির সংখ্যালঘু লোক বাস করে। ২০০১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী দেশে আদিবাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর খানার (Household) মোট সংখ্যা ২ লাখ ৮৯ হাজার ৯২৮টি এবং মোট জনসংখ্যা ১৪ লাখ ১০ হাজার ১৬৯ জন। চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে বেশি আদিবাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বাস করে।

বাংলাদেশে মোট সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শতকরা ৪৯.৮২ ভাগ চট্টগ্রাম এবং ২৫.৭৭ ভাগ রাজশাহী বিভাগে বাস করছে। চট্টগ্রাম বিভাগের বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু উপজাতি জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। ২০০১ সালের তথ্যানুযায়ী এ তিন পার্বত্য জেলায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শতকরা ৪২.০৫ ভাগ বাস করে। রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ, দিনাজপুর এবং সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বাস করছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার সবগুলোতেই উপজাতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কমবেশি বসবাস করছে। তবে অনেক জেলায় এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যেমন– লক্ষ্মীপুর জেলায় মাত্র ১৮৫ জন, ফেনী জেলায় ১৯১ জন, ঝালকাঠি জেলায় ৮৭৭ জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ৬২৪ জন, নরসিংদী জেলায় ৬২৯ জন, শরীয়তপুর জেলায় ৫৯৮ জন, মাগুরা জেলায় ২৯৬ জন, মেহেরপুর জেলায় ৫৫১ জন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বসবাস করছে (২০০১)।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাসে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পরিচিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় জীবন, উৎসব ও অর্থনৈতিক নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি।

■ **السؤال (١٢)** : اكتب الخطوات المتوقعة لكثرة انتاج الأسماك الطبيعية فى بنغلاديش -

■ প্রশ্ন : ১২ ॥ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক মৎস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ লেখ।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো মৎস্য সম্পদ। বাংলাদেশে মৎস্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

➲ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো–

১. মৎস্য চাষের উন্নতির জন্য দেশের অভ্যন্তরে মৎস্য বিভাগ নামে সরকারের একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিভাগ দেশের নানা ধরনের পুকুর ও জলাশয়ের সংস্কার সাধন করে মৎস্য চাষের উন্নতির জন্য তৎপর রয়েছে।

২. প্রতিটি জেলায় জেলেদেরকে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করছে। এ সমস্ত সমিতির মাধ্যমে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩. ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং জাটকা নিধন রোধে জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের চাল, ডালসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে।

৪. পোনা মাছ নিধন রোধকল্পে মৎস্য সংরক্ষণ আইন কার্যকর করা হয়েছে। কারেন্ট জাল দ্বারা মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫. নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও সিলেটের হাওড়গুলোতে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. দেশে বেশ কিছু হ্যাচারী সরকারি উদ্যোগে স্থাপন করা হয়েছে। এসব হ্যাচারীতে মাছের রেণু উৎপাদন করে মৎস্য চাষীদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৭. বেসরকারি খাতে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করার জন্য মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি শুল্ক ও কর হ্রাস করা হয়েছে।

৮. সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য সরকার বিদেশ থেকে ট্রলার আমদানির ব্যবস্থা করেছে এবং ইতোমধ্যেই কয়েকটি ট্রলার আনা হয়েছে। এ সমস্ত ট্রলারে মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

৯. দেশে পোনা চাষেরও ব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছের ক্ষুদ্র পোনা নদী থেকে ধরা হয়। এ সমস্ত পোনা প্রথমে গর্তে ছেড়ে ৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ বড় হলে তা পুকুরে ছাড়া হয়; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ চাষ অতি সামান্য।

১০. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার কয়েকটি উপজেলা বর্ষাপ্লাবিত ধানী জমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করা হয়েছে।

১১. সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য বড় বড় নৌকা, নাইলনের জাল প্রভৃতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সরকার কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে জেলেদেরকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

১২. মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য চাঁদপুরে একটি কারিগরি গবেষণাগার রয়েছে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও মৎস্য সম্পদের উপর একটি আলাদা অনুষদ রয়েছে।

১৩. বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ট্রলারের সাহায্যে মাছ ধরা সম্বন্ধে জেলেদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তাছাড়া, সরকার কর্তৃক ১৭টি সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়নের একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪. সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর দেশের কিছু সংখ্যক মুক্ত জলাশয়ে রুই জাতীয় মাছের পোনা ছাড়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পদক্ষেপগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন হলে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও উদ্যোগী হতে হবে।

■ السؤال (١٣) : بين الموقع الجغرافى وحدود بنغلاديش ـ

■ প্রশ্ন : ১৩ ॥ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানার বিবরণ দাও।

উত্তর।। **ভূমিকা :** অপূর্ব নান্দনিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাস একদিকে যেমন গৌরবময় অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়। বাঙালি জাতির রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, রয়েছে স্বকীয় ইতিহাস। আমাদের এ বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ হিসেবে পরিচিত।

➲ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০ তম। বাংলাদেশ ২০°৩৪ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫ উত্তর অক্ষরেখা) অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব জুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম। তবে পূর্বে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমুদ্র সমতল হতে মাত্র ১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। সমুদ্র সমতল মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলেই এদেশের ১০% এলাকা নিমজ্জিত হবে বলে ধারণা করা হয়। বঙ্গোপসাগর উপকূলে অনেকটা অংশ জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। এখানকার আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব দেখা যায়।

➲ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমার এবং বঙ্গোপসাগরের সীমানা আছে। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল এবং সর্বমোট সীমারেখা ৫,১৩৮ কিলোমিটার। স্থলভাগের সীমারেখা ৪,৪২৭ কিলোমিটার; উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কিলোমিটার। অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪ কিলোমিটার; রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সাথে ২৭১ কিলোমিটার। বাংলাদেশের সীমানার সাথে ভারতের ৫টি রাজ্য রয়েছে। যথা : আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ। মিয়ানমারের ২টি প্রদেশ রয়েছে। যথা : চিন ও রাখাইন। বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩০টি। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩টি। যথা : কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি। ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ১টি। যথা : রাঙ্গামাটি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশের তিনদিকে স্থল ও একদিকে জল। এর সীমানা পরিচিতি লক্ষ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মীয় দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। এদেশের তিনদিকে ভারত এবং একদিকে মিয়ানমার ও বঙ্গোপসাগর; যা অন্যকোনো দেশের সীমানায় লক্ষ করা যায় না।

■ السؤال (١٤) : بين تاريخ المدرسة العالية الحكومية بداكا ـ

■ প্রশ্ন : ১৪ ॥ সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-এর ইতিহাস বর্ণনা কর।

উত্তর।। **ভূমিকা :** সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদরাসা যা ঢাকা আলিয়া নামে অধিক খ্যাত। ১৭৮০ সালে বাংলার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় "কলকাতা আলিয়া মাদরাসা" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে আলিয়া মাদরাসা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকায় আলিয়া মাদরাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর মাওলানা জিয়াউল হক।

➲ সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা এর ইতিহাস

আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা (মাদরাসা-ই-আলিয়া) দাপ্তরিকভাবে "মাদরাসা-ই-আলিয়া" নামে পরিচিত। ১৭৮০ সালে বাংলার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮১ থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত আলিয়া মাদরাসা 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা এবং ১৮১৯ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারি ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারির অধীনে 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা পরিচালিত হয়।

১৮৫০ সালে আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ কর্মকর্তাগণ এ পদ অলংকৃত করেন। ১৮২৯ সালে আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৪ বছরে এ বিভাগে ১৭৮৭ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করেন। ১৮৫৪ সালে মাদরাসায় একটি পৃথক ইনস্টিটিউট হিসেবে ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ভর্তির সময় শরাফতনামা (উচ্চ

বংশে জন্মের সনদপত্র)-এর উপর জোর দেওয়া হতো। ইংরেজি এবং ফারসি ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-ফারসি বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। ১৮২১ সালে মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাদরাসায় প্রথাগত পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৮৫৪ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত 'ডেস্পাচ'-এ কলকাতা মাদরাসাকে প্রস্তাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসার ইঙ্গিত থাকলেও মাদরাসাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়নি। ১৮৬৩ সালে কলকাতা মাদরাসায় এফ.এ পর্যায়ের ক্লাস সংযোজিত হয়। ১৯০৭ সালে মাদরাসায় তিন বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু হয়। ১৯৪৭ সালে আলিয়া মাদরাসা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং নামকরণ করা হয় "মাদরাসা-ই-আলিয়া", ঢাকা। ১৯৬০ সালে মাদরাসা লক্ষ্মীবাজার থেকে বকশীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন খান বাহাদুর মাওলানা জিয়াউল হক। বর্তমানে মাদরাসায় প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী ও ৫০ জন শিক্ষক রয়েছেন (সূত্র উইকিপিডিয়া)। মাদরাসাটির রয়েছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, কম্পিউটার ল্যাব, খেলারমাঠ এবং ছাত্রাবাস। ২০০৬ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অধিভুক্ত হয়। ২০১৬ সালে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ঢাকার বকশীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশেও এ মাদরাসা ইসলামি শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

■ **السؤال (١٥) :** تحدث عن مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية لبنغلاديش.

■ প্রশ্ন : ১৫ ॥ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান আলোচনা কর।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** দেশের মোট জনশক্তির অর্ধেকই নারী। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা উৎপাদন ও সেবার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে কম নয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে নারীসমাজকে যত বেশি সম্পৃক্ত করা যাবে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াস তত সফল হবে।

➲ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **কৃষিক্ষেত্রে :** ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের পুরুষরা মাঠে ফসল বপন-রোপণ, বর্ধন ও কর্তনের কাজটি করে থাকে। তবে উপজাতীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষ গ্রামবাংলার অনেক পরিবারেই মহিলারা মাঠের কাজে অংশ নেয়। এছাড়া ফসল মাড়াই, প্রক্রিয়াকরণ, গোলাজাতকরণ ও সংরক্ষণের কাজগুলো প্রধানত মেয়েরাই করে থাকে। সার্বিকভাবে পুরুষের কৃষিকর্মের পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে মেয়েদের অবদানও কম নয়। কেননা, শস্যকে খাদ্যোপযোগী করার সকল প্রক্রিয়ার কাজ সাধারণত নারীই করে থাকে।

২. **কুটির শিল্পে অবদান :** কুটির শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এ শিল্পে পণ্যের মূল উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে মেয়েরা, আর পণ্য বাজারজাতকরণের ভূমিকায় থাকে পুরুষ। তাঁত শিল্পে মেয়েদের অবদান অগ্রগণ্য। উপজাতীয় মেয়েরা নিজ হাতে তাদের কাপড় তৈরি করে। এছাড়া আজকাল শৌখিন ও দর্শনীয় পণ্য মেয়েরা ঘরে বসেই উৎপাদন করে থাকে।

৩. **নির্মাণ খাতে :** আমাদের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু খাত হচ্ছে নির্মাণ খাত। এ খাতেও মেয়েরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ইটের ভাটা, মাটি কর্তন, ইট ভাঙা, ইট সুরকি পরিবহণ প্রভৃতি কাজে নারী শ্রমিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৪. **তৈরি পোশাক শিল্পে :** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তথা তৈরি পোশাক শিল্প। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৯.৬ ভাগই আসে এ শিল্প থেকে। এ শিল্পে নিয়োজিত ১৮ লক্ষ শ্রমিকের শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগই মহিলা। এই বিপুল সংখ্যক মহিলা শ্রমিকের নিরন্তর শ্রমই বাংলাদেশকে আজ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়েছে।

৫. **উৎপাদনমুখী শিল্পখাতে :** সম্প্রতি গঠিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অধিকাংশ শিল্পকারখানাতেই নারী শ্রমিকদের সংখ্যা অধিক। তাছাড়া প্যাকেজিং, ওষুধ, বয়ন ও খাদ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে অধিকতর দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। যে-কোনো হালকা শিল্পে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অধিকতর উৎপাদন সহায়ক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৬. **জাতি গঠনমূলক কাজে ও জনপ্রশাসনে :** আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষকই মহিলা। তাছাড়া বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষায়িত শিক্ষায় মহিলাদের দক্ষতা ও কৃতিত্ব বিস্ময়কর। আজকাল প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত নারীরা অলংকৃত করছে। তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিচারক, ব্যারিস্টার এমনকি শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে জাতি গঠনে সফলকাম হচ্ছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, আজকের বিশ্বে প্রথা ও রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী পুরুষের অংশগ্রহণমূলক শ্রেণি পার্থক্য। এমনকি আজকের নারী অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে। আমরা যদি আরও দ্রুত উন্নতি অর্জন করতে চাই এবং বিশ্বের বুকে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই তাহলে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও অধিক পরিমাণে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অবদান খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।